ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। কেননা, উপজাতীয়দের জমিগুলিকে অ-সাঁওতালি জমিদার ও মহাজনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় পুলিশের এবং রেলপথ নির্মাণ কাজে কর্মরত ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অত্যাচার। বহিরাগতদের সাঁওতালরা বলত ডিকু। এদের প্রবেশের ফলে সাঁওতালদের পরিচিত জীবনের ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। হারানো ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার জন্য তারা বাধ্য হয়ে লড়াইয়ে নামে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাঁওতালেরা জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেয়। কিন্তু কেউই তাদের সেই চরমপত্রে কর্ণপাত করে নি। তখন হাজার হাজার সাঁওতাল তীরধনুক নিয়ে সরাসরি বিদ্রোহে নেমে পড়ে। তাদের "তিন কুখ্যাত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে — জমিদার, মহাজন, ও ব্রিটিশ সরকার"।[৮৫] বিদ্রোহ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাগলপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে কোম্পানির শাসন কার্যত ভেঙে পড়ে। এতে সরকারি মহলে আতঙ্ক ছড়ায়। এমতাবস্থায় নিম্নবর্ণীয় অনুপজাতীয় কৃষকেরাও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করত। এর ফলে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে পাল্টা নৃশংস পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নির্মমভাবে প্রতিহিংসার বশে একের পর এক সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি হিসেবে দেখা গেছে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীদের মধ্যে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার সাঁওতালকে চূড়ান্তভাবে বিদ্রোহ দমনের আগেই মেরে ফেলা হয়।[৮৬] এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের ব্যাপারে অনেক বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে নিয়ে আলাদা করে একটি প্রশাসনিক বিভাগ তৈরি করা হয়। নাম দেওয়া হয় সাঁওতাল পরগণা। এই নামের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের বিশিষ্ট উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সত্তাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গোটা উপমহাদেশ জুড়ে আরও অনেক বিদ্রোহই ঘটেছিল, তবে উপরোক্ত কৃষক বিদ্রোহগুলি চোখে পড়ার মত। এসব বিদ্রোহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে কোন ধরনের সোজাসাপটা মতামত প্রকাশ করায় ঝুঁকি আছে। তবুও খুব বৃহদাকারে বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক যুগে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণেই কৃষকদের অভিযোগ দেখা দেয়। বেদনার্ত কৃষকদের উদ্বেগ এইসব বিভিন্ন বিদ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বের আগের যুগে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করত বটে, তবে কৃষকদের কাছে জীবননির্বাহের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে তাঁরা সচরাচর প্রতিবাদের পথে যেতেন না। মুঘল আমলে এব্যাপারে একটা বোঝাপড়া ছিল। (প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে)। আঠারো শতকে সেই বোঝাপড়া ভেঙে যায়, কারণ উদ্বৃত্ত আদায় আগের চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। এর ফলে কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনে হাত পড়ে। পরিণামে বারে বারে ঘটে কৃষক বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক রাজস্ব ব্যবস্থা সেই প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করে। তবে ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিতে ধারাবাহিকতা অপেক্ষা

পরিবর্তনই ছিল বেশি। এ বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্যোগই ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়া। কৃষিব্যবস্থাকে তাই ধনতান্ত্রিক করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কৃষি সম্পর্কের ওপরে যার বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে। জমির ওপরে সম্পত্তিগত অধিকার সৃষ্টি হয়। পরিণামে জমি হয়ে ওঠে বাজারি পণ্য। এরই ফলে প্রথাগত উৎপাদন সম্পর্ক দূরীভূত হয়ে যায়। চলে আসে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে নজরানার পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হিসেবে লভ্যাংশ আদায় হয়ে ওঠে প্রধান। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কখনই সম্পূর্ণ হয় নি, যেহেতু নজরানা ও লভ্যাংশ আদায় দুটিই পাশাপাশি বজায় ছিল। তার ফলে সমস্ত পরিচিত কৃষি সম্পর্কগুলিই আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে।

রণজিৎ গুহর মতে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণামে "জমিদারি ব্যবস্থা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল"।[৮৭] সম্পত্তিগত সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে যায়। কৃষকেরা তাদের প্রজাস্বত্ব অধিকার হারায়। তাদেরকে ইচ্ছামত উৎখাত করা যেত। অর্থাৎ তাদের সামাজিক মর্যাদায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের প্রজাসত্বের বিষয়টি নিয়ে ভাবত না। সেই সংক্রান্ত অধিকারগুলি সংরক্ষণের চিন্তাও করত না। রাষ্ট্রের উচ্চাহরে ধার্য রাজস্বের চাপ গিয়ে কৃষকদের ঘাড়েই পড়ত। সেই সঙ্গে যুক্ত হত রাজস্ব আদায়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম এবং নির্দয় ব্যবহার। কৃষকদের দুর্দশা বাড়ত। ব্রিটিশ আইনে জমিদারদের কৃষক নিপীড়নের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জমিদারদের সামরিক ক্ষমতা কার্যত খর্ব করা হয় নি। বরং জমিদার-দারোগা, এই জুটির মাধ্যমে সেই ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে থাকে। নতুন নতুন আদালত আর বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা জমিদারদের দণ্ডমূলক কর্তৃত্বকে বাড়িয়ে দেয়। জমিদারদের মনে করা হত নিপীড়নের হোতা, যারা রাষ্ট্রের দ্বারা সুরক্ষিত। কাজেই জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানেই সেটা সহজেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত। জমিদারেরা ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের চাইতে বেশি উৎসাহী ছিল শোষণে কেননা, জমিদারেরাও রাষ্ট্র কর্তৃক উচ্চ রাজস্ব ধার্যের ও সূর্যাস্ত আইনের ক্রমাগত চাপের অধীনে থাকত। জমি বাজারি পণ্য হওয়ার ফলে জমি হস্তান্তরের হার বেড়ে যায় এবং যে, ঘটনাটি জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল, তা হল ঋণদানের নতুন সম্পর্ক। উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য হওয়ার ফলে কৃষকদের ধারে টাকা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলেই মহাজনদের এবং ব্যবসায়ীদের গ্রামীণ সমাজের ওপরে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। কৃষকদের ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে একটা সময়ে তারা জমি থেকে উৎখাত হয়ে যেত। সেই জমি চলে যেত অ-কৃষক শ্রেণীর হাতে। রণজিৎ গুহর ভাষায় জমিদারের, মহাজনেরা ও রাষ্ট্র এই তিনে মিলে "কৃষকদের ওপরে সংযুক্ত প্রাধান্য কায়েম করেছিল"।[৮৮]

উপজাতীয় কৃষকদের পীড়িত হওয়ার বিশেষ কতগুলি কারণ ছিল। এরা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কৃষক সমাজের প্রান্তীয় এলাকায় বাস করত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ভোগ করত স্বাতন্ত্র্য। একটি সার্বিক সমান অধিকারের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের সমাজজীবন। কালে কালে তারা হিন্দু হয়ে ওঠে এবং জাতপাতের ক্রমবিন্যাসের নিপীড়নের চাপে পড়ে যায়। তার ওপরে ঘটে ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিস্তার। ফলে উপজাতীয়দের স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। উপজাতীয়দের জমিগুলি অত্যাচারের হোতা জমিদার ও মহাজনদের হাতে চলে যাওয়ায় তারা বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে তাদের স্বাভাবিক অধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায়, ব্রিটিশ আইনের শাসন চাপিয়ে উপজাতীয়দের ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাদের সেই কল্পিত স্বর্গময় অতীত জীবনটিকে অনধিকারী বহিরাগতরা—সুদ ও ডিকুরা—ধ্বংস করে দেয়। এর ফলেই উপজাতীয়দের সহিংস বিস্ফোরণ ঘটে।

ঔপনিবেশিক পর্বের প্রথম দিককার এইসব কৃষক ও উপজাতীয়দের বিদ্রোহগুলিকে বিভিন্নভাবে ভাবা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসন এসবকে আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা বলে মনে করত। মনে করা হত এসব উপজাতীয়রা সভ্যতাবিরোধী অসভ্য আদিম প্রবৃত্তির। জাতীয়তাবাদীরা পরবর্তীকালে তাদের ঔপনিবেশিক সরকার-বিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে এই সব কৃষক ও উপজাতীয়দের ইতিহাসকে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে এবং সেসব আন্দোলনকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রাক্-ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরে। ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স্ বলতেন এগুলি হল "প্রাথমিক প্রতিরোধ, অর্থাৎ পরম্পরাগত সমাজের হিংসাশ্রয়ী প্রতিবাদমূলক কাজ, এরই পরিণতিতে ঔপনিবেশিক শাসন চাপানো হয়"।[৮৯] ডি.এন. ধনাগারের মত ঐতিহাসিকেরা বলেন এই কৃষক বিদ্রোহগুলি ছিল "প্রাক্-রাজনৈতিক," কারণ সেসব বিদ্রোহে কোন সংগঠন, কর্মসূচী অথবা মতাদর্শ ছিল না।[৯০] অন্যদিকে রণজিৎ গুহ বলেছেন "গ্রামের সাধারণ মানুষের জঙ্গি আন্দোলনের মধ্যে অরাজনৈতিক কিছুই ছিল না"।[৯১]

উপরোক্ত বিদ্রোহগুলি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একেবারেই ছিল না। কৃষকদের বিদ্রোহগুলি ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। যদিও ভিন্ন পথে, তবুও এসব বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনীতি-সচেতনতাই প্রকাশ পেত। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন (১৯৯৪ খ্রি:) যে, কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নানারকম সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষকদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। কর্তৃত্বের সেই কাঠামোটিকে উল্টিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও তাদের ছিল। বিদ্রোহীরা অত্যাচারের রাজনৈতিক মূল উৎসগুলি সম্বন্ধে সজাগ ছিল। এটাই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত—জমিদারের বাড়ি ও তাদের শস্যাগার, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং শেষমেশ ব্রিটিশের রাষ্ট্রযন্ত্র। কেননা, ব্রিটিশেরা

তাদের প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়ে অত্যাচারের স্থানীয় দালালদের রক্ষায় এগিয়ে আসে। বিদ্রোহীরা তাদের বন্ধুদের চিনে নেবার পাশাপাশি শত্রুদেরও চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে আমরা প্রায়ই একটা জিনিস খুঁজে পাই। সেটা হল প্রাধান্যকারী শ্রেণীর ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিপীড়িতের সম্পর্কের পরিবর্তন, যদিও বিদ্রোহীদের প্রতিবাদ ছিল বহুরূপী। বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, কোন অপরাধ নয়, কেননা বিদ্রোহ ঘটত প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে। সাঁওতালেরা যথেষ্ট আগে থেকেই সতর্ক করে দিত। রঙপুরের নেতারা বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপরে কর বসিয়েছিল। প্রকাশ্যে সভা, সমিতি, জমায়েত ও পরিকল্পনা হত। এথেকে বোঝা যায় তাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিশ্চয়ই থাকত। বিদ্রোহীদের সমারোহপূর্ণ অভিযান হত। সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল তাদের সম্মিলিত শ্রম, যেহেতু তারা মনে করত বিদ্রোহ ছিল তাদের পরম্পরাগত শিকারমূলক কাজেরই সামিল। তবে এই বিদ্রোহে তাদের সেই শিকারী মানসিকতার একটি নতুন রাজনৈতিক অর্থ সৃষ্টি হয়ে ছিল।

এইসব কৃষক বিদ্রোহের নেতা বিদ্রোহীদের মধ্য থেকেই স্থির হত। যেহেতু নেতারা কৃষক ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমনস্ক হত, তাই তারা উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারত। কৃষকদের সমাবেশ ঘটত সম্প্রদায়কে করেই। ব্যতিক্রম ছিল রঙপুর বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক আমলে গ্রামীণ সমাজে নানারকম টানাপোড়েন থাকত—শ্রেণীগত, জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠীগত। গ্রামে গ্রামে অত্যাচার আর দারিদ্র্যের কারণে এইসব উত্তেজনা হিংসাশ্রয়ী হয়ে প্রকাশ পেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মই বন্ধন রচনা করত। আর নেতারা অতিপ্রাকৃত উপায়ে তাদেরকে নতুন যুগের ভোরে পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত।[৯২] প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে সচেতনতা উন্নত ছিল না, সেখানে ধর্মই বিদ্রোহের মতাদর্শ যোগাত। বিদ্রোীরা তাদের নেতাদের পবিত্র মনে করত। সেই পবিত্র নেতারা নৈতিক যুগের অবসানের কথা বলতেন এবং রূপকের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করতেন। এইভাবেই ধর্ম তাদের আন্দোলনকে বৈধ করে তুলত। নিপীড়িত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ-কল্যাণকর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিদাতা জননায়কদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী মনে করা হত। তাদের ক্ষমতাপ্রয়োগকে মনে করা হত ঈশ্বরের কাজ। এইভাবেই তাদের বিদ্রোহ বিধিনির্দিষ্ট হত এবং উচ্চতর কোন কর্তৃত্বের সাপক্ষে বৈধ হত। এটি কৃষকদের মতাদর্শের কাজ করত। তাদেরকে প্রেরণা জোগাত। এইসব কৃষক বিদ্রোহ আধুনিক জাতীয়তাবাদের চাইতে আলাদা ছিল। বিদ্রোহীদের জাতিগত অবস্থান ও সীমা সম্বন্ধে ধারণা অনুযায়ী বিদ্রোহের বিস্তার ঘটত। বিদ্রোহী সম্প্রদায় যে-ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করত এবং কাজ করত, সেই অঞ্চলেই বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হত। যেমন সাঁওতালদের সংগ্রাম ছিল 'পিতৃভূমি'র জন্য। তবে কখনও কখনও জাতিগত বন্ধন ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে

যেত। যেমন কোল বিদ্রোহ। একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের কোলরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সময় সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের নিজস্ব ধারণারও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকত। ইতিহাসে একটা ধারণার প্রায়ই উদ্ভব ঘটে। সেটা হল সুদূর অতীতে এক "স্বর্ণযুগ" ছিল।[৯৩] সেই কল্পিত স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনার তাগিদই কৃষকদেরকে মতাদর্শগত প্রেরণা জোগাত। ফারাজী ও সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল তার আদর্শ উদাহরণ।

উপরোক্ত সশস্ত্র ও অসংঠিত বিদ্রোহগুলি ছাড়াও সামাজিক দস্যুবৃত্তি, "আইন-শৃঙ্খলাহীনতা" ইত্যাদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে একেবারে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছিল। সহযোগিতা আর বিদ্রোহের মধ্যে সীমানা প্রায় ছিলই না, কারণ যারা সহযোগিতা করতেন তাদের মনেও বিদেশী শাসকদের প্রতি একটা অপছন্দ ও ঘৃণার ভাব থাকত। যেমন কলকাতার ভদ্রলোকদের কথা ধরা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর তাদের আস্থা ছিল। কৃষক বিদ্রোহকে তারা প্রবল উৎসাহে সমালোচনা করত। সেই হেন ভদ্রলোকেরাও বলেছিল অনুগত সাঁওতালেরা বিনা কারণে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি।[৯৪] কৃষক সম্প্রদায়ের মত শহুরে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষেরাও তাদের প্রতিবাদে সমানভাবে সুসংবদ্ধ ছিল। ১৮৩৩–৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লি ও পশ্চিম হিন্দুস্তানে শস্য নিয়ে দাঙ্গা বাধে। এবং শস্য ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যের ও মধ্যস্থতাকারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ভেলোরে চাল নিয়ে দাঙ্গা হয়ে ছিল। ১৮০৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের হুমকির বিরুদ্ধেও দাঙ্গা হয়েছিল। অবাধ বাণিজ্যের চাপে হস্তশিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাই নিয়ে কলকাতাতে হস্তশিল্পীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একই সমস্যা নিয়ে সুরাটে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৭৯০-এর দশকে এবং ১৮০০ অব্দে। ১৮০৯ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও বারাণসীতেও হস্তশিল্পীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহ যে সবসময়ে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী হত, তা নয়। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি ও শর্তাদির সঙ্গে এসব বিদ্রোহের সম্পর্ক থাকত।[৯৫] তবে ভারতে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিরোধ ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ।

৩.৩ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে সেসব অঞ্চলে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসন-শৃঙ্খলা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কোম্পানি ও বিদ্রোহী উভয় তরফেই ব্যাপক হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন যেমন "সতর্কভাবে হিংসার একাধিপত্য গড়ে তোল," তেমনি

যেত। যেমন কোল বিদ্রোহ। একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের কোলরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সময় সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের নিজস্ব ধারণারও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকত। ইতিহাসে একটা ধারণার প্রায়ই উদ্ভব ঘটে। সেটা হল সুদূর অতীতে এক "স্বর্ণযুগ" ছিল।[৯৩] সেই কল্পিত স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনার তাগিদই কৃষকদেরকে মতাদর্শগত প্রেরণা জোগাত। ফারাজী ও সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল তার আদর্শ উদাহরণ।

উপরোক্ত সশস্ত্র ও অসংঠিত বিদ্রোহগুলি ছাড়াও সামাজিক দস্যুবৃত্তি, "আইন-শৃঙ্খলাহীনতা" ইত্যাদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে একেবারে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছিল। সহযোগিতা আর বিদ্রোহের মধ্যে সীমানা প্রায় ছিলই না, কারণ যারা সহযোগিতা করতেন তাদের মনেও বিদেশী শাসকদের প্রতি একটা অপছন্দ ও ঘৃণার ভাব থাকত। যেমন কলকাতার ভদ্রলোকদের কথা ধরা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর তাদের আস্থা ছিল। কৃষক বিদ্রোহকে তারা প্রবল উৎসাহে সমালোচনা করত। সেই হেন ভদ্রলোকেরাও বলেছিল অনুগত সাঁওতালের বিনা কারণে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি।[৯৪] কৃষক সম্প্রদায়ের মত শহুরে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষেরাও তাদের প্রতিবাদে সমানভাবে সুসংবদ্ধ ছিল। ১৮৩৩–৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লি ও পশ্চিম হিন্দুস্তানে শস্য নিয়ে দাঙ্গা বাধে এবং শস্য ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যের ও মধ্যস্থতাকারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ভেলোরে চাল নিয়ে দাঙ্গা হয়ে ছিল। ১৮০৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের হুমকির বিরুদ্ধেও দাঙ্গা হয়েছিল। অবাধ বাণিজ্যের চাপে হস্তশিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাই নিয়ে কলকাতাতে হস্তশিল্পীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একই সমস্যা নিয়ে সুরাটে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৭৯০-এর দশকে এবং ১৮০০ অব্দে। ১৮০৯ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও বারাণসীতেও হস্তশিল্পীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহ যে সবসময়ে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী হত, তা নয়। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি ও শর্তাদির সঙ্গে এসব বিদ্রোহের সম্পর্ক থাকত।[৯৫] তবে ভারতে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিরোধ ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ।

৩.৩ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে সেসব অঞ্চলে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসন-শৃঙ্খলা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কোম্পানি ও বিদ্রোহী উভয় তরফেই ব্যাপক হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন যেমন "সতর্কভাবে হিংসার একাধিপত্য গড়ে তোল," তেমনি